মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম [রহ.]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শূরা-ই-নিজাম

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা
ও
শূরা-ই-নিজাম

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম [রহ.]

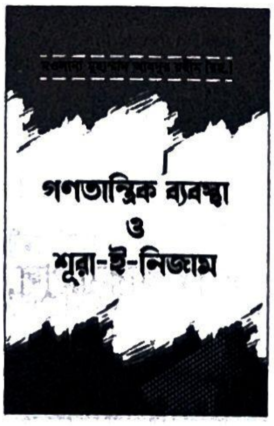

প্রকাশনায়
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৮৫/১-এ (৪র্থ তলা), পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৭১৩৩৭৩৩৩, ০১৭১৮৩৭৮৯৯৬

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শূরা-ই-নিজাম

গণতন্ত্র বর্তমান দুনিয়ার একটি বহুল আলোচিত মতবাদ। মানুষ এ দুনিয়ায় বসবাসের জন্য নিজের আইন নিজেই তৈরি করবে। দুনিয়ার এক বিপুল সংখ্যক মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি প্রচণ্ডভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাদের কাছে গণতন্ত্র হচ্ছে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা; এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষ অর্জন করতে পারে তার কাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি তাই? পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মানুষ কি সুখ ও শান্তির দরিয়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ? এ প্রশ্নটি সম্ভবত গণতন্ত্রপ্রেমীরা আদৌ খতিয়ে দেখেন না। তাই গণতন্ত্রের নামে দুনিয়ায় যত শোরগোল উঠছে, মানুষের জীবনে দুঃখ-দৈন্য ততই বাড়ছে। এমনকি সত্য কথা এই যে, গণতন্ত্রের হোতারাই মানুষকে দুঃখ ও দৈন্যের মুখে ঠেলে দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

এটাই স্বাভাবিক। কারণ, গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব বিস্তারের এক সর্বনাশা প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় মুষ্টিমের ধূর্ত ও শঠ প্রকৃতির মানুষ খুব সুকৌশলে বৃহত্তর জনসমাজের ওপর প্রভু হয়ে বসে। তারা নানা মুখরোচক বুলির আড়ালে সাধারণ মানুষকে দাসানুদাসে পরিণত করে এবং তাদের ভাগ্য নিয়ে ইচ্ছামতো ছিনিমিনি খেলে। আর হতভাগা মানুষ একেই স্বাধীনতা ও স্বাধিকার ভেবে গণতন্ত্রের জন্যে প্রাণপাত করে। সুখের মুখ তারা কোনোদিনই দেখে না; তা চিরকাল শুধু সোনার হরিণরূপে ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

অথচ মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদ্ধতি। মানুষ নিজের আইন নিজেই তৈরি করবে না। কারণ এই মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই দিয়ে দিয়েছেন মানুষের জন্য আইন বিধান, তাঁর হুকুমেই চলবে সব কিছু। এসব বিষয় নিয়েই ১৮৮২ সালে তাঁর অনুগত ছাত্রদের এক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে মওলানা বলেন ঃ

আজকে আমি এখানে যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাই তা হলো ইসলামে শূরা-ই-নিজাম বলতে কী বুঝায় এবং বর্তমানে আমাদের দেশে যে গণতন্ত্রের কথা বলা হয় সেটাই-বা কী জিনিস, কোথা থেকে এর উৎপত্তি এবং মূলত এর উদ্দেশ্যই বা কী?

মওলানা বলেন : 'শূরা' শব্দটি কুরআন মজীদের একটি সূরার নাম । এর শাব্দিক অর্থ হলো পরামর্শ করা অথবা পরামর্শভিত্তিক একটি ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে, বর্তমান দুনিয়ায় যে গণতন্ত্র প্রচলিত তাকে বলা হয় Democracy। এটি আসলে একটি 'ল্যাটিন শব্দ'। এর প্রথমাংশ Demo মানে 'গণ' এবং cracy অর্থ তন্ত্র বা 'আইন'। এই মিলিয়ে বানানো হয়েছে গণতন্ত্র; অর্থাৎ এ এমন একটি ব্যবস্থা যা জনগণের মর্জি অনুযায়ী চলে। এবার এ দু'টির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যাক। তবে এ তুলনামূলক আলোচনারও একটি পদ্ধতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে— যেটাকে 'লজিক' বা মানতেক (যুক্তিবিদ্যা) যুক্তিধারা বলা হয়।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, এই দু'টি ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী ? এ পর্যায়ে বলতে গেলে অন্তত দুই রকমের সম্পর্ক দেখানো যেতে পারে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে تَوَافُقْ (তাওয়াফুক) পারস্পরিক সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য। আর একটি হচ্ছে ইন্দাজ কণ্ঠতম تَبَايُنْ (তাবায়ান) পারস্পরিক বিরুদ্ধতা বা বৈসাদৃশ্য অর্থাৎ দু'টির মধ্যে কোনো মিল নেই। এছাড়া আর একটি হচ্ছে عَمَا خَاصْ مَطْلَقْ (আম খাস-মাতলক)- এ এমন একটি পরিভাষা যে, দু'টি জিনিসের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু মিল পাওয়া যায় আবার অনেক জায়গায় মিল পাওয়া যায় না। যাই হোক এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, প্রচলিত গণতন্ত্র ও ইসলামের শূরা-ই-নিজাম এ-দু'টির মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে تَبَايُنْ (তাবায়ুন) অর্থাৎ পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একটি অপরটির সঙ্গে কোনো দিক দিয়েও একবিন্দু মিল, সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য রাখে না।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে গণতন্ত্র প্রচলিত, তা দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও চালু আছে। আসলে এটি একটি মতবাদ- একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন। যার দু'টি দিক আছে— একটি হচ্ছে তাত্ত্বিক অন্যটি বাস্তব।

মাওলানা বলেন ঃ 'তাত্ত্বিক দিক দিয়ে গণতন্ত্র বলতে যে জিনিসটিকে বোঝায় সেটাকে কুফর ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এটি একটি জীবন দর্শন— তা ইসলামের ঠিক বিপরীত জিনিস। প্রথম কথা হলো ইসলাম ও গণতন্ত্র এ দু'টিই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিষয়। রাষ্ট্রের অধীন সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে এক একটা ব্যবস্থার নাম দেয়া হয়েছে। সে হিসেবে এক বিশেষ ধরনের সমাজ ব্যবস্থার নাম দেয়া হয়েছে গণতন্ত্র। অপর এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থার নাম হচ্ছে 'ইসলাম'।

সমাজ ব্যবস্থা বলতে আমি বুঝাতে চাইছি সমাজের মূল দার্শনিক ভিত্তি। সে হিসেবে সমাজের কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, রীতি-নীতি, তার আইন-বিধান, রাষ্ট্র-পদ্ধতি, রাষ্ট্র পরিচালন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, শাসক নিয়োগ পদ্ধতি এ সব কিছুই এর আলোচনার বিষয়ে আসে। ইসলামের অবলম্বিত সামাজিক ব্যবস্থা কীরূপ ? সেখানে অনুসৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বা কী— সব কিছুই এই আলোচনার বিষয় হিসেবে আসে।

এদিক দিয়ে বলা যায় যে, গণতন্ত্র আর ইসলাম দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতাদর্শ। বিপরীত দর্শন, বিপরীত ভাবধারা ও বিপরীত ব্যবস্থাসম্পন্ন জীবন দর্শন। কোথাও এ দুয়ের মাঝে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেকোনো সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় এবং যার জবাব দিতেও তারা বাধ্য, তা হলো সার্বভৌমত্ব কার ? Sovereignty belongs to whom—কে সার্বভৌমত্বের মালিক ? মূলত সার্বভৌমত্ব এমন একটি জিনিস যা ছাড়া কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে না। মানুষের কোনো সামষ্টিক সংস্থা গড়ে উঠতে পারে না সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া। সুতরাং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে একটি ধারণা গ্রহণ করতেই হবে। তারপর তারই ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এছাড়া কোনো সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি যে কোনো দৃষ্টিতেই বিবেচনা করলে প্রশ্নটি সর্বাগ্রে চিন্তাবিদদের মনে জাগবে এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সামনে এক বিন্দুও অগ্রসর হওয়া যাবে না। কাজেই দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যত আলোচনার বিষয় এসেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সর্বপ্রথম প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন।

প্রচলিত গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্যে নয়। তাতে বরং আল্লাহকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর এই অস্বীকার করা হয়েছে দু'টি রূপে। একটি রূপ হলো— আল্লাহ আছেন বটে, কিন্তু তিনি আসমানে থাকেন। এই জমিনের মানুষের ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব চলে না। আল্লাহর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার না করেও বাস্তবভাবে মানুষের সমাজ জীবন, বৈষয়িক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে আল্লাহকে সম্পূর্ণ বেদখল করে দেয়া এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য। অন্য রূপটি হলো— না, আল্লাহ বলতে কেউ নেই। সব কিছু আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটা হলো ডারউইনী বিবর্তনবাদের মূলকথা। পাশ্চাত্যে এই মতাদর্শনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।

গণতন্ত্রের উৎপত্তি

গণতন্ত্রের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে, এর উৎপত্তি হয়েছে ইউরোপে এবং সূচনা হয়েছে ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে কিংবা চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে। তখন গোটা ইউরোপ ছিল চার্চের একচেটিয়া প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বের অধীন। আর চার্চ খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উপাসনালয় বিধায় ধর্মের কর্ণধার পোপ, পাদ্রী, পুরোহিতরা এই রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা ও ভাগ্যবিধাতা হয়ে দাঁড়াল। সমস্ত জনতা ছিল তাদের অধীন। এই ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসিত স্পেন ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র থেকে খ্রিস্টানরা কিছু কিছু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তা ইউরোপে গিয়ে প্রচার করতে শুরু করে। এর ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে যে মূর্খতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ব্যাপকতা লাভ করেছিল তার বিরুদ্ধে ইউরোপের নব্য চেতনাসম্পন্ন যুবকদের মনে বিদ্রোহের ভাব শুরু হয়। এ সময় 'বেকন' সহ কয়েকজন ইউরোপীয় স্পেনের গ্রানাডাস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছিলেন। সেখানে ইসলামী দর্শন, ইসলামী জীবন বিধান, চিন্তার স্বাধীনতা সম্পর্কে যে জ্ঞানের সন্ধান তারা পান, সেই জ্ঞান নিয়ে ইউরোপে চলে যান। সেখানে গিয়ে তারা চিন্তার স্বাধীনতার ব্যাপক প্রচার আরম্ভ করে।

গীর্জা কর্তৃপক্ষ যখন লক্ষ্য করলো যে, গীর্জার একচেটিয়া কর্তৃত্বকে যুবসমাজ চ্যালেঞ্জ করছে, গীর্জার বাধ্যবাধকতা পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে তারা রাজি হচ্ছে না, তারা চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবি করছে। ফলে এটা গীর্জার জন্য অর্থাৎ গীর্জার একচেটিয়া কর্তৃত্বের জন্য অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে দেখা দিলো। গীর্জা কর্তৃপক্ষ মনে করলেন, চিন্তার এ স্বাধীনতা যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে গীর্জার এই একচেটিয়া কর্তৃত্ব আর থাকবে না। যে কর্তৃত্ব এতোদিন ধরে ভোগ করে আসছে পোপ-পাদ্রী-পুরোহিত তা অচিরেই তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

ফলে গীর্জা কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে এই নব্য চেতনাসম্পন্ন স্বাধীন চিন্তার অধিকারী লোকদের ওপর জুলুম-অত্যাচার শুরু করে দিলো। অন্যদিকে বিজ্ঞানচর্চাও ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গেল গোটা ইউরোপে। গীর্জা কর্তৃপক্ষ সে বিজ্ঞান চর্চাকেও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিলেন। হুকুম জারী হয়ে গেল, কেউ কোনো ধরনের চিন্তা-ভাবনা বা জ্ঞান- চর্চা করতে পারবে না।

কিন্তু লোকদের মনে যখন নতুন চিন্তা-চেতনার স্রোত বইতে শুরু করে তখন তাকে আর সহজে থামানো যায় না। একদিকে এই চিন্তা-চেতনার বিস্তার ঘটতে লাগল আর অন্যদিকে গীর্জার কর্তৃত্ব হুমকির সম্মুখীন বলে জুলুম-অত্যাচারের

মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়াতে লাগল। যার ইতিহাস অত্যন্ত করুণ এবং এতই মর্মান্তিক যে, গীর্জা একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে এর ধর্মভীরু পোপ পাদ্রীরা চিন্তার এ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনকে পুরোপুরি অস্বীকার করল আর যারা এ চিন্তা-চেতনা লালন করে তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করল— তাদেরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হলো। অনেককে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হলো। তাদের অপরাধ ছিল চিন্তার ক্ষেত্রে তারা স্বাধীনতা ভোগ করতে চাচ্ছে। যে ধরনের চিন্তা-চেতনা গীর্জার পাদ্রীরা কোনো দিন জনগণের সামনে পেশ করেনি, স্বাধীন চিন্তার অধিকারীরা তা-ই দাবি করে বসল।

ফলে অত্যাচার ক্রমশই তীব্রতর হয়ে উঠল। আর অত্যাচার যতই বাড়তে লাগল, চারদিকে বিদ্রোহও ততই বাড়তে লাগল। এ বিদ্রোহ আর থামানো গেল না। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে গীর্জা ও রাষ্ট্র আলাদা হয়ে গেল। এ দুইয়ের আর এক থাকা গেল না। অবশ্য ইউরোপীয় সমাজে গীর্জা আর স্বাধীন চিন্তা-চেতনা লালনকারী লোকদের সাথে একটা সমঝোতা হলো। তা হলো এই যে, গীর্জা নিছক ধর্মচর্চা করবে আর রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বৈষয়িক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করবে এবং সেগুলো পরিচালনা করবে। কাজেই এ দু'টির মধ্যে সরাসরি কোনো সম্পর্ক থাকবে না, সে জন্যে এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এভাবে রাষ্ট্র ও গীর্জা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায় পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ রাষ্ট্র গীর্জার ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না আর গীর্জাও রাষ্ট্রের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। ধর্ম বহির্ভূত যাবতীয় বিষয়ের পুরো কর্তৃত্ব থাকবে রাষ্ট্রের কাছে।

এরও পূর্বের ইতিহাস হলো, ইউরোপে প্রথম ছিল সামন্তবাদ। সামন্তবাদ বলতে বুঝায়, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একজন নরপতি; তিনি সে এলাকার সব জমির মালিক এবং সে এলাকার লোকদের ওপর তিনি একমাত্র প্রভু ও শাসক। তার মর্জি পালন করতে এবং তার হুকুম মানতে প্রতিটি মানুষ বাধ্য। মোটামুটি আমাদের দেশের অধুনালুপ্ত জমিদারি প্রথার মতো। অনেকে হয়তো এ বিষয়ে শুনেছেন এবং ইতিহাসেও পড়েছেন জমিদারদের নির্যাতনের কথা। তারা হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন সামন্তবাদের অবস্থা। এক কথায়, এদেশের জমিদারির মতো সামন্তবাদ গোটা ইউরোপে ছায়া বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে সামন্তবাদ ভেঙে যায়। তারপর আসে রাজতন্ত্র ও বংশানুক্রম ক্ষমতা ভোগের পালা। রাজারা বড় বড় এলাকা নিয়ে এক এক রাজত্ব পরিচালনা করত। জনগণ এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে এবং ক্রমে ক্রমে সেটাও খতম হয়ে

যায়। এরপর প্রশ্ন ওঠে, দেশে এখন কী ধরনের শাসন চলবে? আর তা পরিচালনাই বা করবে কে?

সামন্তবাদে এক ব্যক্তি ছিল একটি এলাকার হর্তাকর্তা। ফলে সার্বভৌমত্ব ছিল তারই হাতের মুঠোয়। আবার বড় বড় রাজত্বে রাজা-বাদশাহরা ছিল সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তাদের মর্জিমতো গোটা এলাকার গোটা অঞ্চলের সমস্ত মানুষ জীবন যাপন করত। মানুষের ওপর শাসনকার্য চালাবার নিরঙ্কুশ অধিকারও ছিল তাদের। তাদের মুখের কথাই ছিল রাজ্যের আইন।

ইউরোপের নব্য চিন্তাবিদরা নতুন চিন্তার আলোকে সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্র উভয়কেই উৎখাত করার পর প্রশ্ন জাগল, এখন সার্বভৌমত্ব কার ? কার হুকুমে চলবে দেশ?

ঠিক এ সময়ে পশ্চিম চিন্তাবিদরা এর একটি সমাধান দিলেন— যেহেতু দেশের সকল নাগরিকই দেশের মালিক, অতএব সকলের মত জেনে এবং সকলের রায় নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। এটাকে বলা হয়, জেনারেল উইল বা সর্বসাধারণের মত অর্থাৎ সর্বসাধারণের মত নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। আর এভাবেই আসে 'গণতন্ত্র'। এরপর এ 'গণতন্ত্রের' বাস্তব রূপটা কী হবে তা নিয়েও ইউরোপে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে যে, দেশে কোনো সামন্তবাদ নেই, কোনো রাজা-বাদশাহ বা সম্রাটও নেই; তাহলে সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক প্রকৃতপক্ষে কে হবে ? এই সর্বোচ্চ মালিক কর্তৃত্বধারী হওয়ার ব্যাপারটিকে তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছে। যেমনঃ দেশের নাগরিকদের অধিকার হিসেবে বলা হয়েছে যে, কোনো দেশের সমগ্র জনগণই সে দেশের মালিক। দেশের সার্বভৌমত্ব তাদেরই করায়ত্ত। তারাই সার্বভৌম। তবে একটি দেশের দশ কোটি কিংবা নব্বই কোটি মানুষ সকলে মিলে তো সরাসরি দেশ শাসন করতে পারে না। সেজন্যে তারা বাছাই করে তাদেরই মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পাঠাবে এবং জনগণের পক্ষ থেকে তারাই দেশ পরিচালনা করবে, এটা সর্বশেষ সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়াল। বলা হলো, জনগণ ভোট দেয়ার অধিকারী; তারা যাদেরকে ভোট দেবে তারাই তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে পার্লামেন্টে। এই প্রতিনিধিদের কাজ হলো, ভোটদাতাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং পার্লামেন্টে সেগুলোর সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করা।

এভাবে জনগণের প্রতিনিধিরা হলেন দেশ শাসন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের অধিকারী। এছাড়া মৌলনীতি নির্ধারণ এবং সে জন্যে আইন-কানুন তৈরির যাবতীয় কর্তৃত্ব এই জনপ্রতিনিধিদের হাতে অর্পণ করা হয়।

এরপর প্রশ্ন দেখা দেয়, প্রতিনিধি তো নির্বাচিত হবে; কিন্তু তার পদ্ধতিটা কী হবে ? কেমন করে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে ? এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যে সিস্টেম উদ্ভাবন করেছে তা হলো, রাজনৈতিক দল গঠন করা। একে ভিত্তি করে সমাজে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। জনগণের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বা চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন রকমের নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে এই সকল দল গঠিত হয়। এভাবে বিভিন্ন চিন্তা-চেতনায় একমত লোকেরা একেক দলে সংঘবদ্ধ হয়। এরপর সে সব দলের লোকেরা তাদের মতবাদকে ব্যাপকভাবে জনগণের সামনে পেশ করে এবং পরবর্তীতে জনগণ তাদের মতবাদ সমর্থন করে কি না তা যাচাই হয় ভোটের মাধ্যমে।

এভাবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের একটা বিশেষ অবদান হলো- পলিটিক্যাল পার্টি গঠনের ধারা প্রবর্তন। এ ধারা অনুসারে দেশে পলিটিক্যাল পার্টি হতে হবে; কেননা পলিটিক্যাল পার্টি গঠন করা জনগণের একটি মৌলিক অধিকার— তা দুই-তিনজন মিলে হোক কিংবা বহুসংখ্যক লোক নিয়ে হোক। কিন্তু দেশের জনগণ যেহেতু বিভিন্ন মত পোষণ করে, সেহেতু যে যার মতো করে পার্টি বা দল গঠন করে। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় যখন আসে তখন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় মেনিফেস্টো নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হয়। নির্বাচিত হলে দেশ ও জাতির জন্যে তারা কী কী করবে তার বিস্তারিত বিবরণ জাতির সামনে পেশ করে, যদিও অনেকে নির্বাচিত হয়ে তাদের প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে যায়।

যা হোক পরবর্তীতে এই চিন্তাবিদরা দু'টি পদ্ধতি বের করে। জনগণের ভোটে সরাসরিভাবে সর্বোচ্চ শাসক নির্বাচিত হবে— যার হাতে দেশের সার্বভৌমত্ব থাকবে অথবা জনগণের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিরা দেশের সর্বোচ্চ শাসক নির্বাচিত করবে। এর একটি হলো প্রেসিডেন্সিয়াল আর একটি পার্লামেন্টারি পদ্ধতি।

প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে দেশের সর্বোচ্চ শাসক সরাসরিভাবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত করা হয়; তিনি হন প্রেসিডেন্ট। তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করেন। তাদের মধ্য থেকে

নিজেদের পছন্দমতো লোকদের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন নির্বাচিত ব্যক্তিরা হাতে ক্ষমতা গেলেও দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতেই থেকে যায়। যেহেতু তিনি সরাসরিভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ? সেহেতু এ ক্ষমতা তিনিই ভোগ করেন।

আর পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে জনগণ প্রথমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। তারপর সেই প্রতিনিধিরা তাদের মধ্য থেকে দেশের সর্বোচ্চ শাসক নির্বাচিত করে। তিনিও কোনো-না-কোনো এলাকা থেকে নির্বাচিত অর্থাৎ তিনিও একজন পার্লামেন্ট মেম্বার। এরপর তিনি হন হেড অব দি পার্লামেন্ট বা সংসদ নেতা-লিডার অব দি হাউজ। এভাবেই নিযুক্ত হন দেশের প্রধানমন্ত্রী। আর তারই হাতে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

পরবর্তীকালে এই মূল পলিটিক্যাল চিন্তার আরও কিছু বিকাশ ঘটেছে, তা হচ্ছে, কোনো দেশে এক ব্যক্তির হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকলে সে যেকোনো সময় যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কাজেই একটা ভারসাম্য বা চেক এন্ড ব্যালেন্সের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সেই চেক এন্ড ব্যালেন্সের চিন্তা করতে গিয়ে পার্লামেন্টের নেতা বা প্রধানমন্ত্রীর সাথে একজন প্রেসিডেন্টের কথা চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। পদ্ধতিটা এ রকম যে, প্রসিডেন্ট যিনি হবেন তাকে পার্লামেন্টের মেম্বাররাই নির্বাচিত করবেন এবং তাঁর হাতেও কিছু ক্ষমতা থাকবে। যেমন, পার্লামেন্ট কোনো আইন পাশ করলে সেটা আইন হিসেবে চালু হতে শুধু প্রেসিডেন্টের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর লাগবে। ব্যস, এটুকু ছাড়া আর কিছুই নয়; কারণ পার্লামেন্টে আইন পাশ হয়ে যাবার পর প্রেসিডেন্ট তাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

এর আরও একটি পদ্ধতি আছে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে! সেটা হলো, প্রেসিডেন্ট থাকবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে। পার্লামেন্ট আইন পাশ করলেও সেখানে পার্লামেন্টের নেতা হিসেবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকে, সেহেতু প্রধানমন্ত্রী যাতে বাড়াবাড়ি বা সীমালজ্ঘন করতে না পারে সেজন্য কিছু কিছু ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে দিয়ে দেয়া হয়। তা এই বলে দেয়া হয় যে, প্রেসিডেন্ট যদি কোনো আইনকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য অকল্যাণকর বা ক্ষতিকর মনে করেন তবে তিনি আইনটির ক্ষতিকর দিকগুলোকে চিহ্নিত করে পার্লামেন্টে পুনরালোচনার জন্যে অনুরোধ জানাবেন। এ ক্ষমতাটুকু কোথাও কোথাও প্রেসিডেন্টকে কার্যতই দেয়া হয়, আবার কোথাও কোথাও শুধু নামকাওয়াস্তে প্রেসিডেন্ট থাকেন যার নিজের কোনো ক্ষমতাই থাকে না। তিনি একটা পুতুল অথবা একটি কলম মাত্র। প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে পাশ করা যে

আইনই তার সামনে পেশ করা হবে তাতে তিনি স্বাক্ষর বা সম্মতি দিতে বাধ্য। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেমন এ ধরনের সরকার চলছে। তাই বলতে গেলে পৃথিবীতে দু'টি সিস্টেম চালু আছে— একটি প্রেসিডেন্সিয়াল আর অন্যটি পার্লামেন্টারি সিস্টেম।

পার্লামেন্টারি সিস্টেমে জনগণের ভোটে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন এবং যে দলের অধিক সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন তারাই পার্লামেন্টে গিয়ে সরকার গঠনের লক্ষ্যে একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তবে বাস্তব অবস্থা এই যে, যিনি প্রধানমন্ত্রী হন তাকে আবার সকলের আস্থাভাজন হতে হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব একটা মনোভাব থাকে, আবার তার সামনে দলীয় নানা বাধ্যবাধকতাও থাকে। তবে নেতা যদি যোগ্যতাসম্পন্ন হন তাহলে নিজের মতকে দলের পার্লামেন্ট সদস্যদের দ্বারা খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পারেন।

এ সিস্টেমে সরকার বরাবরই কিছুটা দুর্বলতার মধ্যে থাকে। কারণ দলীয় লোকদেরকে প্রায়শ সন্তুষ্ট রাখার একটা প্রবণতা থাকতেই হয়। তাদের সুযোগ-সুবিধা, দাবি-দাওয়া, তাদের সমর্থকদের চাকরি প্রদান, তাদের এলাকায় রাস্তাঘাট বানানো এরূপ নানান কাজ-কর্মের সুযোগ দিয়ে দলীয় সদস্যদের বাধ্য রাখতে হয়। আবার সুযোগ সন্ধানী স্বার্থবাদী পার্লামেন্ট সদস্যরাও জনগণের স্বার্থ আদায়ের চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে অনেক স্বার্থ আদায় করে নেয়। এরপর যখন এ প্রতিনিধিরা সুযোগ পায় এবং বুঝতে পারে তাদের একটা ভোটের মূল্য অনেক বেশি তখন তাদের মূল্যায়নও হয় অনেক বেশি। সাথে সাথে স্বার্থের পরিমাণও বেড়ে যায়। বস্তুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সৃষ্ট এত সব জঞ্জাল ও আবর্জনার মোকাবিলা করে একটি শক্তিশালী সরকার চলতে পারে না। এ কারণেই এ সমস্ত এলাকায় প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির স্বৈরাচারী চরিত্র

প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমে যেহেতু এক ব্যক্তিই আগে ভাগে দেশের সকল ভোটার দ্বারা নির্বাচিত হয়ে যায় সেহেতু সে ব্যক্তিই হয় দেশের সকল ক্ষমতার মালিক। সে যতদিন আছে ততদিন সরকার স্থিতিশীল। সরকারের কোনো অদল বদল হয় না। সকালে এক সরকার আর বিকেলে অন্য এক সরকার- এ রকম হতে পারে না। (পাকিস্তান আমলে এ রকম ঘটনা এদেশে ঘটেছে)। তবে এটুকু হতে পারে যে, প্রেসিডেন্ট যাদেরকে নিয়ে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন তাদের মধ্য থেকে যদি

কেউ প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা বা মর্জিমতো কাজ না করে বা করতে না চায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেই হলো, তুমি পদত্যাগ করে চলে যাও। যেমন— এখানে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়া ও এরশাদের সময় এ রকম হয়েছে। মোটকথা এ সিস্টেমে এক ব্যক্তি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা পুরোপরি ভোগ করেন।

এদিক থেকে আমাদের দেশে যে প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম চলছে তা আরও ভয়ানক! বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট বার এসোসিয়েশন আয়োজিত এক সেমিনারে আমি পর্যালোচনা করে দেখিয়েছি যে, আমাদের দেশের তৎকালীন সংবিধানে প্রেসিডেন্টের হাতে দেশের সমস্ত ক্ষমতা এমনভাবে চলে গিয়েছে যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এমনকি তাকে প্রায় আল্লাহর সমতুল্য ক্ষমতা (নাউযুবিল্লাহ) দেয়া হয়েছ। তিনি এই ভূখণ্ডে যা খুশি তাই করতে, যাকে ইচ্ছা মন্ত্রী বানাতে এবং যাকে ইচ্ছা সরিয়ে দিতে পারেন। এমনকি তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্টও ভেঙে দিতে পারেন। সংসদ নির্বাচনের পর যদি দেখা যায় যে, প্রেসিডেন্টের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেনি তখন তিনি তার মর্জিমতো পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারেন। এমনিভাবে যখন খুশি তিনি পার্লামেন্ট ডাকবেন। আর যদি না ডাকেন তবে পার্লামেন্টের অধিবেশন হতে পারে না। একবার তো ছয় মাস পর্যন্ত দেশে পার্লামেন্টের অধিবেশনই হয়নি। এখানে প্রেসিডেন্টের স্বৈরাচারী ইচ্ছায় সব কিছু সংঘটিত হয়।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে আমার বক্তব্য

এ পদ্ধতিতে সাধারণত কমসংখ্যক লোকেরা দেশের শাসন চালায়। যেমন ধরা যাক, একটি নির্বাচনী এলাকায় তিন থেকে চার-পাঁচজন পর্যন্ত প্রার্থী থাকে। তার মধ্যে একজন প্রার্থী ভোট পেল ১০ হাজার, একজন পেল ১২ হাজার আর একজন পেল ১৪ হাজার আর একজন পেল ১৫ হাজার। যে ব্যক্তি পনেরো হাজার ভোট পেল সে-ই নির্বাচিত হলো। আর বাইরে থাকল (১০+১২+১৪) মোট ৩৬ হাজার ভোট। তাহলে দেখা গেল, এই ৩৬ হাজার ভোটারের ভোট মাঠে মারা গেল, তাদের সমর্থন কোনো কাজে আসল না। এই অধিক সংখ্যক ভোটারের মত এবং তাদের ইচ্ছা রাষ্ট্রের কাজে কোনো প্রভাব ফেলতে পারল না। অথচ অল্পসংখ্যক ভোট পেয়ে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে গেল প্রচলিত গণতান্ত্রিক সিস্টেমে। এভাবে অল্পসংখ্যক ভোট পেয়েও সদস্যরা পার্লামেন্টে আসে। এরপর আরও মজার ব্যাপার হলো— পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা

সর্বমোট ৩০০ জন । এই ৩০০ জনের মধ্যে অন্তত ১৫১ জন যখন কাউকে সমর্থন করে তবে সে সরকার গঠন করে। এই ১৫১ জন লোকের প্রাপ্ত ভোট যদি গণনা করা হয় আর এর বাইরে যারা রয়ে গেল তাদের ভোট সংখ্যা গণনা করা হয় তাহলেও দেখা যাবে, অনেক ক্ষেত্রে সরকারের বাইরে থাকা লোকদের পক্ষে বেশিসংখ্যক লোকদের সমর্থন (ভোট) রয়েছে। এখানেও দেখা যায় গণতান্ত্রিক সিস্টেমে মাইনরিটি বা কমসংখ্যক লোকই শাসন ক্ষমতার মালিক হয়ে বসে।

এরপর মনে করুন একটা পার্টির মধ্যে ১৬০ জন সদস্য পার্লামেন্ট মেম্বার। এখন সে পার্টির মধ্যে আবার বিভিন্ন নেতার বিভিন্ন গ্রুপ আছে। সে গ্রুপের মধ্যে যার লোকসংখ্যা বেশি তাদের সমর্থিত ব্যক্তি হয় প্রধানমন্ত্রী। অন্য গ্রুপের যে মত তা সেখানে ব্যর্থ হয়ে যায়।

আবার যখন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হয় তখনও ঐ ১৬০ জন সদস্য আর মন্ত্রী-মিনিস্টার হতে পারে না। অল্প কয়েকজন সদস্যই কেবল সে সুযোগ পায়। তাদের হাতেই থাকে দেশের সর্বময় ক্ষমতা। ফলে সরকারের সমর্থনেও যে বাকি সদস্যরা রইলেন তাদের মতও অনেক সময় কার্যকর হয় না। তাদের সপক্ষে যে জনগণ ভোট দিয়েছিল তাদের আশাও পূর্ণ হয় না। এভাবে যেকোনো দিক দিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে, গণতান্ত্রিক সিস্টেমে অল্পসংখ্যক লোকই শাসনের আসল সুবিধা ভোগ করে। অর্থাৎ মাইনরিটি বা কমসংখ্যক লোক দ্বারা দেশ শাসিত হয়। তাই বলতে হয়, গণতন্ত্র আসলে ধোঁকাতন্ত্র– একটা বাস্তব প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ এমন এক প্রতারণা যা দিনের উজ্জ্বল আলোতেই সবাইকে দেয়া হচ্ছে, অথচ কেউ বুঝতে পারছে না। তদুপরি গণতন্ত্রটা একটা বিরাট ধোঁকা হয় তখন যখন একে মেজরটি লোকের শাসন বলে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়।

এই গণতান্ত্রিক সিস্টেমটা ইংরেজরা আমাদের দেশে চালু করে গেছে তাদের দেশ থেকে এনে এবং একে এমনভাবে চালু করে গেছে যে, কমসংখ্যক লোকের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকবে আর বিপুল সংখ্যক লোক তাদের দ্বারা শাসিত হবে। কেননা ইংরেজদের পলিসি হলো, তাদের তৈরী করা যেসব মানব সন্তান তাদের আদর্শের অনুসারী, তাদের চিন্তা-বিশ্বাসের ধারক-বাহক তারা এই দেশের জনসাধারণের মধ্যে সংখ্যায় কম হলেও তাদের হাতেই যেন থাকে দেশের সার্বভৌমত্ব— দেশের শাসনভার স্থায়ীভাবে; তারাই যেন সবকিছু ভোগ করার সুযোগ পায়। বস্তুত সার্বভৌমত্বের দিক দিয়ে এটাই হচ্ছে ইসলাম আর কুফরের মধ্যে পার্থক্য।

লক্ষ্যণীয় যে, গণতান্ত্রিক সিস্টেমে যেহেতু সার্বভৌমত্ব জনগণের সেহেতু জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী তার অংশীদার। তাদের কারো হাতে যখন সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করার সুযোগ আসে তখন তিনি ইচ্ছা করলে দলের লোকদের বাধ্য করে মাত্র কয়েক মিনিটেই গণতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত করে দিতে পারেন।

এই দেশের পার্লামেন্টেই এই ধরনের ঘটনার নজীর রয়েছে। এটা একটা ইতিহাস যে, ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশে মাত্র ১৩মিনিটে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 'হিরো। গণতন্ত্রের জন্য তিনি লড়াই করেছেন, সেজন্য জেলও খেটেছেন। এদেশে তার মতো আর কেউ গণতন্ত্রের জন্য এতো কষ্ট স্বীকার করেনি। গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে তিনি দেশের লোকদের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। সেই কারণে ৭০-এর নির্বাচনে শতকরা ৯৮ ভাগ ভোটও পেয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সেই নেতা ক্ষমতায় এলেন, তারপর ১৯৭২ সনের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ১৯৭৫ সনে এসে তিনি নিজেই (শেখ মুজিব) পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাব পেশ করলে তা মাত্র ১৩ মিনিটে পাশ হয়ে গেল। এভাবে গণতন্ত্রের প্রবক্তা নিজ হাতেই গণতন্ত্র হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি বাকশাল গঠন করলেন। সে ইতিহাস আপনাদের অনেকেরই জানা

তাই বলছি গণতন্ত্রের পরবর্তী রূপ হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র, নিজতন্ত্র, আমিতন্ত্র এবং আমার খুশি-মর্জী-ইচ্ছার তন্ত্র। এদের এই conseption টা ওদের ওখান থেকে শুরু হয়েছে যে, আল্লাহ বলে কেউ নেই। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে নেই, সার্বভৌম হিসেবে নেই, আইন দাতা বা বিধান দাতা হিসেবে কেউ নেই। ফলে এ ধারণাটা মিলে যায় ডারউইনের থিউরির সাথে যে, লেজহীন বানর মানব আকার ধারণ করেছে তবেই মানুষ হয়েছে। গণতন্ত্র যখন স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হয় তখন এটাও বিস্ময়ের কিছু নয়। তাই গণতন্ত্র শুধু লোক দেখানো জিনিস, লোক ভোলানো জিনিস। এর মাধ্যমে জনগণকে বুঝানো হয় যে, তোমরাও দেশের শাসন ক্ষমতার অংশীদার। কার্যত দেশের চালাক-চতুর ও ধূরন্ধর রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা এ কাজ করে। তারা জনগণকে অধিকারের কথা বললেও আসলে ভোটের পর তাদের কোনো কথাই আর মনে রাখা হয় না— এটাই বাস্তব।

আমি এতক্ষণ ধরে গণতন্ত্রের কথাটাই বেশি আলোচনা করেছি এই কারণে যে, আমাদের এদেশে গণতন্ত্রের চর্চাটাই বেশি হয়ে থাকে— লোকেরা এতে সঠিকভাবে বুঝতে পারুক আর না-ই পারুক। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে গণতন্ত্র সবচেয়ে সস্তা বুলি। যে যেভাবে ইচ্ছা এ বুলিটাকে ব্যবহার করে থাকে। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্র ধ্বংস করে ক্ষমতা দখল করেন। সেই এরশাদ সাহেবও নাকি এখন গণতন্ত্র কায়েমে প্রস্তুত। যে গণতন্ত্রে জনগণ ভোট দিয়ে মেম্বার নির্বাচিত করবে আর তারা পার্লামেন্টে গিয়ে আইন বানাবে সেই গণতন্ত্র কায়েমই নাকি তার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ধরনের গণতন্ত্র তো প্রেসিডেন্ট সাত্তারের আমলেও ছিল। তিনিও জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশে মোটামুটি একটা পার্লামেন্টও ছিল জনগণের নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারাই। এরশাদ সাহেব সেটাকে খতম করে বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করে পরের দিনই ঘোষণা করেন, আমি 'গণতন্ত্র' দেবো। তাহলে প্রশ্ন— তুমি যদি গণতন্ত্র দেবেই তবে যে গণতন্ত্র ছিল সেটাকে হত্যা করলে কেন ? খুন করলে কেন সেই গণতন্ত্রকে ? আসলে গণতন্ত্রের কোনো মা-বাপ নেই। এ এমন এক এতিম সন্তান যে, প্রত্যেকেই এর বাপ হতে চায়। যারা ক্ষমতা হারালেন তারা আবার যারা তাকে হত্যা করে ক্ষমতায় গিয়ে স্বৈরাতন্ত্র চালিয়েছে তারাও এর বাপ— এর গার্জিয়ান। এক এতিম সন্তানের গার্জিয়ানশিপ নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি চলছে আমাদের দেশে।

মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে প্রচলিত গণতন্ত্রের মূল কথা। সংক্ষেপে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং এ নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশ শাসনের কাজ করে। জনগণ নীতিগতভাবে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হলেও কার্যত তাদের প্রতিনিধিরাই দেশ শাসনের কাজ করে, সার্বভৌমত্ব ভোগ করে এবং যা ইচ্ছা তাই করে। গণতন্ত্রের থিউরিতে বলা হয়েছে : Government of the People by the People for the People— অর্থাৎ জনগণের শাসন, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্যে। এখানে আল্লাহও নেই রাসূলও নেই, কুরআনও নেই, হাদীসও নেই। গণতন্ত্রে আল্লাহর শাসন নয় বরং মৌলিকভাবে জনগণের শাসন তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে জনগণের প্রতিনিধিরা যে আইন পাশ করে সে আইন আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী হলেও জনগণ তা মানতে বাধ্য হয়। পার্লামেন্টে আইন রচনা করার সময় আইন রচনাকারীরা এটা দেখে না যে, আমরা যে আইন রচনা করছি তা আল্লাহর কুরআন ও রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাহ সম্মত, নাকি তার বিরোধী। এসব দেখতে তারা বাধ্য নয়। কেননা গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে সেক্যুলারিজম অর্থাৎ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। আমি প্রথম দিকে বলেছি যে, যখন রাষ্ট্রে গীর্জার একচেটিয়া শাসন ছিল তখন তাকে বলা হতো থিউক্রেসি— ধর্মতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র বা যাজকতন্ত্র। অন্যকথায় ধর্মের দিক দিয়ে যারা নেতা তথা পাদ্রী, পুরোহিত, পোপ— এদের তন্ত্র ছিল ।

প্রায় এক হাজার বছর ধরে তাদের মতবাদ ছিল ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্ব। অর্থাৎ এ মতবাদ অনুযায়ী রাজা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজের ইচ্ছামতো দেশ শাসন করত। পরিণামে যাজকদের সমর্থনে রাজাগণ নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং জনগণের ওপর নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার চালায়। এরপরে রাষ্ট্র আর গীর্জা যখন দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল তখন রাষ্ট্রীয় থিউরি হলো গণতন্ত্র (Democracy) । জনগণের ইচ্ছাটা প্রতিফলিত হবে রাষ্ট্রের প্রশাসন বা রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে, এটা হলো গণতন্ত্র; কিন্তু এই গণতন্ত্রের মধ্যে নীতিগতভাবে আল্লাহকে অনুল্লিখিত রাখা হয়েছে। আল্লাহ বলে কেউ আছে এতে তার কোনো উল্লেখ নেই। এই না থাকার কারণ এই হতে পারে যে, আল্লাহ থাকলেও থাকতে পারেন; কিন্তু মানুষের কায়কারবার, জীবন যাপনে কোথাও আল্লাহর কোনো দরকার নেই। কারণ সেক্ষেত্রে আল্লাহর কিছু করবার নেই, বলবারও নেই। মানুষের জন্যে তাঁর আইন-বিধান দেয়ার কোনো অধিকার নেই আর দিলেও আমরা তা পালন করতে বাধ্য নই। বস্তুত এই চিন্তা-ভাবনা নিয়ে গণতন্ত্রের বুনিয়াদ তৈরি হয়েছে।

গণতন্ত্র ও শূরা-ই-নিজামের তুলনা

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাথে শূরা-ই-নিজামের তুলনা করতে হলে সর্বপ্রথম যে পার্থক্যটা আসবে তা হচ্ছে সার্বভৌমত্বের। ইসলামে সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত। গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব নীতিগতভাবে জনগণের, কিন্তু কার্যত তা জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। সে ভোট ব্যালট পেপারে দেয়া হোক কিংবা মুখে মুখে। এই ভোট দেবার সময় ভোটাররা যাকে ভোটটি দিচ্ছে মুখে উচ্চারণ করুক আর নাই করুক তাকে তারা ভোটের সাথে সাথে এ অধিকারটাও দিয়ে দিচ্ছে যে, তুমি যে আইনটা পাস করবে সেটা আমি মানতে বাধ্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ কি কোনো মানুষকে এ অধিকার দিয়েছেন যে, সে মানুষের জন্যে আইন তৈরি করবে?

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষ আল্লাহর খলিফা। সে কারণে একজন খলিফা যখন তার খিলাফতের দায়িত্ব অন্য কারো ওপর ন্যস্ত করে তখন তার মধ্যে

উল্লিখিত শর্ত লিখিত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ সেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের খিলাফতের বিষয়টা চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত হয়েই আছে। অতএব সেখানে ভোটার তার ভোট প্রয়োগ করার সময় ভোট গ্রহীতাকে কোনো নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব দেয় না। সে কেবল এই কর্তৃত্ব দেয় যে, তুমি পার্লামেন্টে গিয়ে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক যে আইনটা বিধিবদ্ধ করবে সেটা আমি মানবো; তোমার নিজের তৈরি আইন হিসেবে নয়— আল্লাহর দেয়া আইন হিসেবে তার আনুগত্য করবো। এখানেই গণতন্ত্রের ভোট দান এবং খিলাফতের ভোটদানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

এই খলিফাগণ যখন জনগণের খিলাফতের একটা অংশ নিয়ে পার্লামেন্টে যাবে তখন কুরআন মজীদের আয়াত অনুযায়ী সেই পার্লামেন্টের নাম হবে, 'মজলিসে শূরা'। এই সিস্টেমটি আল্লাহ তা'আলার দেয়া। এরই মধ্যে থেকে আমি কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি আপনাদের সামনে ঃ

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

> আর তা সেই লোকদের জন্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের রব্ব-এর ওপর নির্ভরতা রাখে। যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জতাসুলভ কাজকর্ম হতে বিরত থাকে আর ক্রোধ হলে তা ক্ষমা করে দেয়। (আশ-শূরা : ৩৬-৩৭)

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার লোকদের পরিচয় দিয়ে কয়েকটি কথা বলেছেন।

প্রথমটি হলোঃ তারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখে।

দ্বিতীয়টি হলোঃ যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জতার কাজ-কর্ম হতে বিরত থাকে। তৃতীয়টি হলোঃ আর যখন তাদের মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয় ।

এরপর আর একটি আয়াত :

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾

যারা নিজেদের রব্বের হুকুম মানে, নামায কায়েম করে, নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে খরচ করে, অর্থাৎ প্রদত্ত রিযিক আল্লাহর বিধান মোতাবেক ব্যয় করে। (আশ্-শূরা ঃ ৩৮)

আলোচ্য আয়াতে 'শূরা বাইনাহুম' কথাটি মুমিনদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর পূর্বে মুসলমানদের কতকগুলো গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেয়, তারা নামায কায়েম করে। তাদের নীতি হলো যে, তারা তাদের পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদি পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করে এবং সে পরামর্শের ভিত্তিতেই আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত রিযিক ব্যয়-বন্টন করে।

সূরা শূরার এ আয়াতের ভিত্তিতে আমরা বলতে চাই— ইসলামের শূরা-ই-নিজাম হলো মুমিনদের জন্যে। আর খোদ নবী করীম (স)-এর কাছে এ সূরাটি (আশ শূরা) মক্কায় নাযিলকৃত সূরাসমূহের মধ্যে একটি। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে মক্কায় সেই অবস্থার মধ্যেও মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্মীয় যাবতীয় ব্যাপারাদি সুসম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পারস্পরিক পরামর্শের নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন।

সূরা আলে-ইমরানে আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন এই বলে –

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

হে নবী! আপনার সঙ্গী-সাথীদের সাথে অর্থাৎ মুমিন মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করুন। (আয়াতাংশ ঃ ১৫৯)

এখানে 'ফিল আমরে' কথাটির মর্ম হচ্ছে সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদি।

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

যখনই আপনি চূড়ান্তভাবে সংকল্প গ্রহণ করবেন, তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে কাজ শুরু করে দিন। (আয়াতাংশ ঃ ১৫৯)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাওয়াক্কুল গ্রহণকারী লোকদের ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। (আয়াতাংশ ঃ ১৫৯)

এখানে আশ্-শূরার প্রথম যে আয়াতটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে দু'টি প্রসঙ্গ আছে। একটি হচ্ছেঃ আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের পরিচিতি দিয়ে বলেছেন যে, তারা যথারীতি নামায কায়েম করে। অর্থাৎ নামায কায়েম না করলে কেউ মুসলমান থাকে না। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছেঃ তাদের এটাও একটা বড় পরিচিতি যে, পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই তারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। এখানে এ অধিকারটি দেয়া হলো খলীফাদের, যদিও কুরআন মজীদের إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً দুনিয়ার সকল আদম সন্তানই আল্লাহর খলীফা এই আয়াতের ভিত্তিতে।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

> তোমাদের মধ্য থেকে যারাই ঈমান আনবে ও তদনুযায়ী নেক আমল করবে তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে তিনি দুনিয়ায় খলীফা বানাবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। (আন-নূর : ৫৫)

এখানে আল্লাহর খলীফা হওয়ার জন্যে ঈমানের সাথে সাথে নেক আমলের শর্ত রয়েছে। আমি এ বিষয়কে এভাবে বিন্যাস করেছি যে, আল্লাহর খলীফা তো সাধারণভাবে সমস্ত মানুষ, সন্দেহ নেই, কিন্তু খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবে সকল খলীফার তরফ থেকে সেই লোকেরা যারা ঈমানদার ও আমলে সলেহ করে। যারা বেঈমান এবং আমলে সালেহ করে না তারা মুসলমানদের তরফ থেকে খিলাফতের দায়িত্ব পেতে পারে না।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে দায়িত্ব পালনের জন্যে মানুষের চরিত্রের কোনো শর্ত নেই। সেখানে শুধু এটুকু শর্ত আছে যে, লোকটি যেন পাগল না হয় আর কোনো অপরাধের কারণে জেল খেটে না থাকে। সেই সঙ্গে বয়সে বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। এ ছাড়া যাকে ভোট দেয়া হচ্ছে সে লোকটা ভালো কী মন্দ, ঈমানদার কী বেঈমান, নামায কায়েম করে কী তা তরক করে, সে মদ খায় কী খায় না,

ব্যভিচারে লিপ্ত কি না, ঘুষ খায় কি খায় না ইত্যাকার যত বড় বড় কবিরা গুনাহ আছে এ সকল থেকে সে মুক্ত কি না এ সকল প্রশ্ন এখানে অবান্তর- এর কোনো মূল্য বা গুরুত্ব সেখানে নেই। এ সব প্রশ্ন তোলা বরং পাশ্চাত্য সেকুলার গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে অপরাধ। এ ধরনের বিষয়ে কোনো প্রচারণা চালানো যাবে না কারো বিরুদ্ধে। তাতে সেখানে বরং মানহানির মামলা হতে পারে।

এ জন্যে কুরআন মজীদ এখানে এই শর্ত আরোপ করেছে যে, আল্লাহর তরফ থেকে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে বুনিয়াদী শর্ত হলো এই যে, সে ঈমানদার এবং নেক আমলকারী হবে। এই ধরনের চরিত্রবিশিষ্ট লোকেরা যখন মজলিসে শূরা অর্থাৎ পার্লামেন্টে একত্রিত হবে তখন জাতীয় সামষ্টিক ব্যাপারাদি তথা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বিষয়াদিতে আল্লাহ ও রাসূলের মৌলিক আইন-বিধান প্রয়োগ করবে। এটাই হবে তাদের প্রধান কাজ। তারা নতুনভাবে কোনো মৌলিক আইন রচনা করবে না, সে অধিকার তাদের নেই। তারা সেটা করতেও পারবে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ.

"হুকুম দেয়া এবং আইন রচনা করার মালিক একমাত্র আল্লাহ।"

এরপরে রাসূলের ওপর হুকুম হলো

وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِیْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ

> রাসূল তাদের জন্য যাবতীয় উত্তম পবিত্র জিনিস হালাল ঘোষণা করেন, যাবতীয় মন্দ-খারাপ জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেন এবং তাদের ওপর থেকে সব দুরূহ বোঝা ও নিগ্রহকারী শৃঙ্খল— যা তাদের ওপর চেপে বসেছে; ছিন্নভিন্ন করে দেন। (আল আরাফ-১৫৭)

সুতরাং রাসূলের পরে যে মজলিসে শূরাই দায়িত্ব পালন করার জন্য আসবে তার সদস্যরা আল্লাহ ও রাসূলের কাছ থেকে পাওয়া আইনগুলোকে "চূড়ান্ত ডিসাইডেড ব্যাপার' হিসেবে গ্রহণ করবে অর্থাৎ যে সব ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে গেছে সে সব ব্যাপারে নতুন কোনো আইনের প্রয়োজন নেই, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা বসবে। সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এভাবে কার্যকর হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্য আল্লাহর আইন জারী হতে হবে এবং এ জারী করার দায়িত্ব আল্লাহর খলীফাদের ওপরে বর্তাবে। পার্লামেন্ট বা শুরা-ই মজলিসে বসে

তাদের চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের বিষয় যা হবে, তা হবে কেবল এই বিষয় নিয়ে যে, আল্লাহ তো এ আইনটা দিয়েছেন, এখন আমাদের সমাজে এটার প্রয়োগ করা যাবে কীভাবে ? কী কী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা করতে হবে। কী কী পদ্ধতিও কতটুকু গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অন্য কিছু করা বা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নতুন কোনো আইন তৈরি করার অধিকার তাদের থাকবে না।

তাহলে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক সিস্টেমে পার্লামেন্টের মেজরিটি সদস্যরা যে আইনের পক্ষে থাকবে সেটি আইন হিসেবে পাশ হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামী খিলাফত তত্ত্বের ভিত্তিতে মজলিসে শূরা গঠিত হয়েছে ঈমানদার ও নেক আমলকারী লোকদের খিলাফতের দায়িত্ব পালন হিসেবে। কোনো সদস্য আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাতের বিপরীত কোনো মত প্রকাশ করার মতো ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না, আর কেউ তা করবেও না। সে জানে যে, আল্লাহর দেয়া আইনকেই চূড়ান্ত আইন হিসেবে মেনে নিতে হবে। কেননা ঈমানদার হিসেবে সেটাই তার করণীয়। আর বেঈমান লোকদের কোনো স্থান মজলিসে শূরায় থাকবে না। ঈমানদার হিসেবে সে এটাই করবে। কেননা তিনি মনে করেন, আল্লাহর যা ফয়সালা আমারও তারই প্রতি ঈমান। আমি নিজেই সে অনুযায়ী আমল করি। যেমন আল্লাহ ব্যভিচার হারাম করেছেন— এখন দেশ থেকে এটা কীভাবে বন্ধ করা যায়, এ ব্যাপারে কী কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে এসব নিয়ে আলাপ হবে। বন্ধ তো করতেই হবে, এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই, এ নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা নেই। কেননা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ডিসাইডেড ব্যাপার।

এখন মনে করুন আমাদের দেশে বেশ্যা প্রথা চালু আছে। হোটেল-মোটেলে প্রমোদবালা আছে। এছাড়া অফিসে, প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছেয়ে গেছে। এখন এটাকে কীভাবে বন্ধ করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, মহিলাদেরকে পার্লামেন্টে ও অফিস আদালতে নিয়োগ করা হচ্ছে এ সব ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। এছাড়া আরও একটা বিরাট সমস্যার দরুন ইদানীং আমাদের যুবক শ্রেণী বলতে গেলে শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর সেটা হলো ভাঙ-গাজা, আফিম, হিরোইন ইত্যাদির ব্যবহার। বর্তমানে আমাদের সমাজকে এ সব মাদকদ্রব্য তীব্রগতিতে ছেয়ে ফেলছে। এছাড়া মদের ব্যবহার তো রয়েছেই। এ থেকে জাতিকে উদ্ধার করার উপায় কী ? এ ব্যাপারে কোন প্রক্রিয়ায় কাজ করতে হবে ? মদসহ তামাম নেশার বস্তু যে হারাম এ ব্যাপারে শূরার সদস্যদের দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। তবে হ্যাঁ, দ্বিমত হতে পারে আইনের প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে এবং তার ওপরেই আলোচনা হবে, এমনকি এ নিয়ে ভোটাভুটিও হতে পারে। যিনি ভালো টেকনিক উপস্থাপন করতে পারবেন

তারটাই গ্রহণ করা হবে। এভাবে শরীয়তের আইনগুলো একের পর এক আলোচনার মাধ্যমে জারি করতে হবে।

ইসলামী সমাজের দায়িত্বশীল লোকদের দৃষ্টি তো এ দিকে নিবন্ধ থাকবে যে, অন্যায়-অবিচার, জুলুম-পীড়ন যা কিছু হচ্ছে সমাজে সব কিছুকে বন্ধ করতে হবে। কোনো মানুষকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, কেউ কারো মান-মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করবে না। এমনিভাবে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টেরও কার্যক্রম চলবে। এ পর্যায়ে পরামর্শ গ্রহণ করার ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। পরামর্শ তথা আলাপ-আলোচনা করে কাজ করার জন্যে রাসূলে করীম (স) কত তাগিদ করেছেন তা এ থেকেই উপলব্ধি করা চলে। যেমন রাসূলে করীম (স) বলেছেন,

اَشِيْرُوْا عَلَيَّ اَيُّهَا النَّاسُ.

"হে লোকেরা! আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে আমাকে পরামর্শ দাও!"

এ আহ্বানের পর সাহাবায়ে কিরামও পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে ও প্রাণ খুলে নবী করীম (স)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এরপর সমাজ জীবনে ভালো-মন্দ ও সুখ-শান্তি কীভাবে হয় সে সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলেছেন :

اِذَا كَانَتْ اُمَرَائُكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ سَمَحَاءُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا.

"যখন তোমাদের শাসক ও কর্মকর্তাগণ হবে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিরা, তোমাদের ধনশালী লোকেরা হবে তোমাদের মধ্যে অধিক দানশীল এবং তোমাদের সামষ্টিক বিষয়াদিতে পরামর্শ গ্রহণ ব্যবস্থা কার্যকর হবে, তখন পৃথিবীর উপরিভাগ (অর্থাৎ জীবনে বেঁচে থাকা) তার নিম্নভাগের অর্থাৎ মৃত্যুর তুলনায় উত্তম হবে। আর যখন এর বিপরীত হবে অর্থাৎ পরামর্শ দেয়া-নেয়ার ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে না, তখন মৃত্যুই জীবনের তুলনায় উত্তম হবে। (তিরমিযী)

মানুষের বিবেক-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায় ঈমানের পরে। তারপর হলো মানুষের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। এটা হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। আর এ প্রসঙ্গেই রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'কোনো ঈমানদার ব্যক্তিই পরামর্শ থেকে বেনিয়াজ হতে পারে না।' আমি কারো ধার ধারি না, কারো কাছে জিজ্ঞাসা

করার প্রয়োজন মনে করি না কোনো বিষয়ে, আমি নিজে এতো বুঝি যে, সব কাজ আমি একাই করবো— এ নীতি কখনো ঈমানদার ব্যক্তির হতে পারে না।

এ পর্যায়ের আর একটি হাদীসঃ

আল্লাহ তা'আলা কোনো নবী পাঠান নি, আল্লাহ তা'আলা কোনো খলীফা বানাননি, তিনি যখনই কোনো নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন বা কাউকে খলীফা বানিয়েছেন তার জন্য দু'টি ধারা অবশ্য ছিল—

একটিঃ আন্তরিক বন্ধুতার ধারা। এতে সবসময় বন্ধুরা ভালো কাজ করার পরামর্শ দিত এবং তাকে সবাই উদ্বুদ্ধ করতো ভালো কাজ করার জন্যে।

দ্বিতীয়টিঃ আর এক প্রকার লোক থাকত যারা শত্রুতা পোষণ করত এবং সব সময় নবীকে খারাপ কাজের পরামর্শ দিত ও সেই কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ এই শেষের কথাটি থেকে বাঁচতে পারে সে-ই যাকে আল্লাহ বাঁচান।

এক হাদীসে নবী করীম (স) বলেনঃ

'পরামর্শ হলো লজ্জা ও অপমান থেকে বাঁচার দুর্গ। আর মানুষের অমর্যাদা থেকে নিষ্কৃতি পাবার রক্ষাকবচ।'

নবী করীম (স)-এর প্রতি 'পরামর্শ করো' বলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ নাযিল হবার পর তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন— এভাবেঃ

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَغَنِيَّانِ عَنْهَا وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللهُ رَحْمَةً لِأُمَّتِيْ.

মনে রাখবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল পরামর্শ করার মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু এ পরামর্শকে আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের জন্যে রহমতস্বরূপ বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

مَنِ اسْتَشَارَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْلِمْ رُشْدًا.

অতএব যে লোক পরামর্শ করবে, সে সঠিক পথ কখনই হারাবে না।

وَمَنْ تَرَكَهَا لَمْ يَعْلِمْ غَيًّا.

আর যে ব্যক্তি পরামর্শের ধার ধারল না বরং নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাই কাজ করল সে বিপথগামী হতে এবং চরম ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

এ জন্যে রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে একটি ভাষণে তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছিলেনঃ

হে জনগণ! তোমরা যদি ধারণা করে থাক যে, আমি নিজে আল্লাহর অনুমোদনের ভিত্তিতে তোমাদের এই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি অথবা ইচ্ছে করে তোমাদের ও অন্যান্য সব মুসলমানের ওপর নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ কাজ করেছি তাহলে মনে রাখবে, এ কথা কিছুমাত্র সত্য নয়। যার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি— আমি নিজ আগ্রহে তা গ্রহণ করিনি অথবা নিজেকে তোমাদের বা কোনো মুসলমানের তুলনায় বড় করে তোলার জন্যে তা গ্রহণ করিনি। আমি কখনই তা পাওয়ার লোভ করিনি— না দিনে, না রাতে। এ জন্যে আল্লাহর নিকটও কখনও প্রার্থনা করিনি— না গোপনে, না প্রকাশ্যে। আসলে একটা বড় বোঝা বহন করার জন্যে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে, যা বহন করার সাধ্য আমার নেই। তবে একমাত্র ভরসা, আল্লাহ যদি আমায় সাহায্য করেন। আমি বরং মনে মনে কামনা করছি, এ দায়িত্ব রাসূলে করীম (স)-এর অপর কোনো সাহাবীর ওপর অর্পিত হোক, তিনি এ কাজে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবেন; তাহলে এই খিলাফত তোমাদের নিকট ফেরত যাবে। তখন আমার হাতে করা এ বাই'আত তোমাদের ওপর বাধ্যতামূলক থাকবে না। তোমরা তোমাদের পছন্দ করা কোনো লোকের ওপর তা অর্পণ করবে। আমি তোমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ হয়েই থাকব।

তিনি রাসূলে করীম (স)-এর মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছিলেনঃ

তোমাদের মধ্যে আমার খিলাফত অপছন্দ করে এমন কেউ আছে কি? থাকলে আমি তার সাথে কথা বলে তা দূর করতে চেষ্টা করব।

অতএব যিনি জনগণের খলীফা হন তিনি মনে করেন না যে, আমি একলা। তিনি বরং মনে করেন এদেশে হাজার খলীফা আছেন। সুতরাং আমি একচেটিয়াভাবে কোনো দায়িত্ব বা কোনো কর্তব্য সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না আমার একক মতের ভিত্তিতে।

এতক্ষণ ধরে আমি আপনাদের সামনে প্রচলিত গণতন্ত্র এবং শূরা-ই-নিজাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করতে চেষ্টা করেছি। এর থেকে যদি আপনারা ফায়দা হাসিল করতে পারেন তাহলে আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

১৯৮৬ সনে পাবনা টাউন হলে সুধী সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণের পর সুধীদের প্রশ্নের জবাব

প্রশ্নঃ জনাব, আপনি নিজেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অধীনে সংসদ নির্বাচন করেছেন। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী ?

জবাবঃ জি-হ্যাঁ, আমি তা করেছি, কোনো সন্দেহ নাই। তবে এ কাজ আমি একা করি নি। আমরা যারা পার্লামেন্টারি (সংসদীয়) ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলাম তারা সকলেই করেছি। আমাদের ধারণা ছিল যে প্রথম নির্বাচন, দ্বিতীয় নির্বাচন, চতুর্থ এবং পঞ্চম নির্বাচনের পরে এমন একটি পরিস্থিতি আসবে যখন পার্লামেন্টে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। এই ভাবনা নিয়ে আমরা ১৯৫১ সন থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত কাজ করেছি। এই পথে চলার ভুল-ভ্রান্তি আমি নিজে অনুভব করা সত্ত্বেও দলীয় সিদ্ধান্তের কারণে আমাকে তা করতে হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ হবার পরে পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ বদলে গেছে, এ কথা আপনাদের অজানা নয়।

পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ইসলামী হুকুমত কায়েম করার লক্ষ্যে। শ্লোগান দেয়া হতো— 'পাকিস্তান কা মতলব কিয়া লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'। পাকিস্তান কায়েম করে ইসলামকে আজাদ করো। এই সকল ছিল ১৯৪৫-১৯৪৬ সনের শ্লোগান। সেই সময়কার যারা বেঁচে আছেন তাদের হয়তো এ কথা স্মরণ থাকবে। আমরাও ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সে আন্দোলনে কাজ করেছিলাম।

সে সময়ে এ উপমহাদেশে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল তাতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছাড়া এখানকার ১০ কোটি মুসলমানের সমস্যার আর কোনো সমাধান ছিল না। যে দেশটি কায়েম হয়েছিল ইসলামের নামে, যদিও সে দেশটিতে ইসলাম কায়েম করা যায়নি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত।

কিন্তু বাংলাদেশ হয়েছে কিসের ভিত্তিতে ? বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর যে সংবিধান রচিত হয় তাতে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানের দাবিদার আওয়ামী লীগ বলে আসছে যে, "মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা পাকিস্তান আমলের সব ধ্যান-ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছি।" তাদের মতে, ধর্মভিত্তিক কোনো রাষ্ট্র হতে পারে না। সুতরাং ধর্মভিত্তিক কোনো আদর্শও গ্রহণ করা যায় না। সে জন্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে তারা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

এহেন বাংলাদেশে সংসদীয় রাজনীতির দ্বারা ইসলামী হুকুমত কায়েম করা যে কোনোক্রমেই সম্ভব নয় একথা আমি "প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদই কাম্য" শীর্ষক ছোট পুস্তিকায় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি। আপনারা যারা এ বইটি পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আমি তার মধ্যে যে কারণগুলো দেখিয়েছি সেগুলো বাস্তব। যারা পড়েননি আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো বইটি পড়ে নিতে। এর মাধ্যমে আমি যুক্তি-তথ্য দ্বারা বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, বর্তমানে প্রচলিত সংসদীয় রাজনীতি দ্বারা ইসলামী হুকুমত কায়েম হতে পারে না। কারণ ইসলামী পক্ষের লোকেরা বিপুল সংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পার্লামেন্টে যেতে পারে না। কেননা এই নির্বাচন টাকার নির্বাচন, টাকার খেলা, প্রভাব-প্রতিপত্তির খেলা, ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের খেলা, ব্যালট বাক্সে জাল ভোট ভর্তির খেলা। এ খেলা কোনো ইসলামী আদর্শবাদী লোকেরা খেলতে পারে না। অতএব, তাদের পক্ষে বিজয়ী হওয়া কিংবা নির্বাচনে জয়লাভ— অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কেননা এ ধরনের নির্বাচনে সব রকম জালিয়াতি ও দুর্নীতি করা হবে আর ইসলামী আদর্শের অনুসারী কোনো ব্যক্তির পক্ষে সে সব দুর্নীতি ও জালিয়াতি তথা চরম শরী'আত বিরোধী কাজ করা কখনো সম্ভব হতে পারে না।

আমি ১৯৭০ সনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি, আমার সাথে আরও অনেক ভাই নির্বাচন করেছেন। তারপর ১৯৭৯ সনে পার্লামেন্ট নির্বাচন করেছি আমি। সৌভাগ্য হোক দুর্ভাগ্যই হোক পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম বিপুল ভোট পেয়ে। এরই ধারাবাহিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেছিলাম দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। অবশ্য এর কোনো নির্বাচনেই আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী ছিলাম না। দল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, আমাকে প্রার্থী হতে হবে। আমি দলীয় সে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলাম। এর সাথে সাথে আমাদের মনে এ চিন্তাও কাজ করছিল যে, ইসলামী হুকুমতের কথা— আল্লাহর আইনের কথা পার্লামেন্টের ভিতরেও বলতে হবে। সেজন্যেও আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা মনে মনে অনুভব করতাম; কিন্তু সব কিছুই ভুল প্রমাণিত হলো।

পরবর্তীকালে আমাদের মধ্যে এ উপলব্ধি জেগেছে যে, আমরা এতদিন যা করেছি তা ইসলাম কায়েমের সঠিক পথ নয়। এ পথে ইসলামের বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা নাই। আমি নির্দ্বিধায় বলতে চাই, সত্য প্রকাশ করার জন্যে আমরা যখন জাতীয় পার্লামেন্টের সদস্য ছিলাম তখন জাতীয় বাজেটের ওপর আমি একটি ভাষণ দিয়েছিলাম, সরকারি দলের লোকেরা পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, সে ধরনের ভাষণ আর কেউ দিতে পারে নি। সে ভাষণে আমি ইসলামী হুকুমতের কথাই বলেছিলাম এবং বলিষ্ঠভাবেই বলেছিলাম। সংসদের প্রতিটি

সদস্য এমনকি গ্যালারিতে বসা শ্রোতারা পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, এ রকম ভাষণ তারা কখনো শোনেনি।

কিন্তু সে ভাষণে কোনো শুভ প্রতিক্রিয়া হয়নি। বাস্তবে আমার কথার কোনো স্বীকৃতি মেলেনি। কেননা সেটা ছিল মানবীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে গঠিত পার্লামেন্ট। "সেখানে ইসলামের দাবি নিভৃতে নীরবে কেঁদে মরেছে, তার কিছুই গ্রহণ করা হয়নি।" কাজেই আমি সিদ্ধান্ত করেছি "ঐ ভ্রান্তপথ নয় ইসলাম কয়েমের জন্যে।"

ইসলাম কয়েমের জন্যে সে পথই একমাত্র পথ যা রাসূলে করীম (স) দেখিয়েছেন এবং তিনি অনুসরণ করেছেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, রাসূলে করীম (স) যখন মক্কায় ছিলেন তখন মক্কাকেন্দ্রিক প্রশাসনের তরফ থেকে তাকে একাধিক প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তাকে এ প্রস্তাবও দেয়া হয়েছিল যে, আমাদের কোনো বাদশাহ নেই-নেতা নেই, তুমি আমাদের বাদশাহ হতে চাইলে আমরা তোমাকে বাদশাহ বানাবো। কিন্তু রাসূলে করীম (স) তা স্বীকার করেননি। আমরা রাসূলে করীম (স)-এর অনুসৃত এই কর্মনীতির মর্মবাণী এতো অন্ধভাবে গ্রহণ করিনি আগে। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে উপলব্ধি বা চেতনা জেগেছে। আমরা বিবেচনা করেছি যে, সংসদীয় পথে আর কোনো কাজ হবে না— ইসলাম কায়েম হবে না । তাই এই পথে চেষ্টা করা, সময়-শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা হবে একেবারেই অর্থহীন। বিগত বছরগুলোতে বহু চেষ্টা করা হয়েছে তাতে সময়ক্ষেপণ আর অর্থব্যয় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। কাজেই ঐ পথ আমরা পরিহার করেছি।

প্রশ্নঃ আগামী সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন অংশগ্রহণ করবে কি ?

জবাব ঃ নিশ্চয়ই না। প্রচলিত ধারার কোনো নির্বাচনেই ইসলামী ঐক্য আন্দোলন অংশগ্রহণ করবে না। ইসলামী ঐক্য আন্দোলন যে সংগ্রাম করছে তার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম একটি ইসলামী সংবিধান রচিত হবে। সেই সংবিধানের অধীনে যদি নির্বাচন হয় তবে সেই নির্বাচনে তারা অংশ গ্রহণ করবে, তার আগে নয়।

প্রশ্ন: জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য কী ? একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?

জবাব ঃ একটু বুঝিয়ে বলতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে। তবুও সংক্ষেপে বলছি, এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মওদূদী সাহেবের বই-পত্রের সাথে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বোধ হয় আমারই পরিচয় ঘটে ১৯৪৫ সনে কলকাতায় বসে এবং সেই বই-পত্র পড়ে

আমি তার সাথে যোগাযোগ করি এবং জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। তদনুসারে কাজ শুরু করি ১৯৪৬ সন থেকে। ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে এলাহাবাদ অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে এই অঞ্চল থেকে আমি যোগদান করেছিলাম। তারপর থেকে আমি এ দলে থেকেই কাজ করতে থাকি।

পাকিস্তান হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার ২০৫, নবাবপুর রোডে অফিস করে মওলানা মওদূদীর বই-পত্রগুলো বাংলায় অনুবাদ করা, এ আন্দোলন চালিয়ে নেয়া, লোকদের মাঝে আন্দোলনের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া ইত্যাকার কাজ বলতে গেলে আমাকে একাকী করতে হয়েছে, করেছি আল্লাহর মেহেরবানিতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার তাগিদে।

জামায়াতের সেই আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল আসলে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারার ভিত্তিতে যা তিনি পত্রিকা তরজুমান কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। এর আগের ইতিহাস হলো, ১৯৪১ সনে ভারতের আলীগড় ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে তাকে আহ্বান করা হয়, আপনার প্রস্তাবিত ইসলামী হুকুমত কীভাবে কায়েম হতে পারে সে বিষয়ে আপনি বক্তব্য রাখুন। তদনুসারে এস্ট্রেচী হলে তাকে এর ওপরে একটি ভাষণ দিতে হয়। উর্দু ভাষায় দেয়া সে ভাষণটি পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। যার নাম ছিল "ইসলামী হুকুম কিসতারাহ কায়েম হোতি হ্যায়।" এর মধ্যে একটি অধ্যায় ছিল ইসলামী ইনকিলাব কি সাবিল– 'ইসলামী বিপ্লবের পথ'। এই বইটি আমিই বাংলায় অনুবাদ করেছি এবং এর নামকরণও করেছি 'ইসলামী বিপ্লবের পথ'। এতে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর জীবন ইতিহাস আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, তার জীবনটাই ইসলামের বিপ্লবী জীবন। মদীনায় যে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছিল সেটা ইসলামী বিপ্লবেরই পরিণতিতে হয়েছিল। কাজেই আমি সে বিপ্লবের দাওয়াত পেয়েই প্রথমে মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তখন থেকে জামায়াতে ইসলামীর কাজ করতে থাকি। মাঝখানে ১৯৪৭ সনে পকিস্তান কায়েম হয়ে যায়।

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর আমরা এই দেশেই 'ইসলামী হুকুমত' কায়েম করার জন্য ১৯৪৮ সন থেকে আন্দোলন শুরু করি। ১৯৪৮ সনের মে মাসে মওলানা মওদূদী করাচীর এক জনসভায় চার দফা মূলনীতি দাবি করেন পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ইসলামী করার উদ্দেশ্যে। সে দাবিগুলো ছিল রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, প্রশাসনে কুরআন ও সুন্নাহর আইন, ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী শরিয়তকে প্রয়োগ ইত্যাদি। অতঃপর পাকিস্তানের সর্বত্র এই আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তারই পরিণতিতে ১৯৪৯ সনের ২৩ শে মার্চ পাকিস্তানে আদর্শ

প্রস্তাব গৃহীত হয়। বলতে গেলে সে আদর্শ প্রস্তাবে এ দাবিগুলোকে একটু ভিন্ন ভাষায় মেনে নেয়া হয়। এটা কিন্তু ছিল একটা আন্দোলন আর এ আন্দোলনটা পুরোপুরি সফলও হয়েছিল।

এভাবে আদর্শ প্রস্তাব পাশ হবার পর আমরা দেশের জন্যে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরি করার আন্দোলন শুরু করি। এই আন্দোলনও সারা দেশব্যাপী চলতে থাকে। এরই ফলে ১৯৫৬ সনে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়।

কেবলমাত্র পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, দেশটি এখন ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়েছে— যেমন একটি লোক কালেমা পড়েছে যে ছিল অমুসলিম। এখন তাকে ইসলামী হুকুম-আহকাম শিখিয়ে পাক্কা মুসলমান বানাতে হবে। এই মূলনীতির ভিত্তিতে। এখন আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, বর্তমান পাকিস্তানের নেতৃত্ব ফাসিক-ফাজির লোকদের হাতে। এদেরকে সরিয়ে যদি ঈমানদার, চরিত্রবান ও নেককার লোকদেরকে বেশি সংখ্যায় পার্লামেন্টে পাঠাতে পারি তাহলে স্বাভাবিকভাবে বিনা রক্তপাতে, বিনা আন্দোলনে, বিনা সংঘর্ষে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে যাবে। আমাদের হিসাব-নিকাশ কতকটা এ রকম ছিল যে, প্রথম নির্বাচনে আমরা শতকরা ২৫টা, দ্বিতীয় নির্বাচনে শতকরা ৩৫টা, তৃতীয় নির্বাচনে ৪৫টি এবং ৪র্থ নির্বাচনে শতকরা ৫৫টি আসন পাবো। আর সংসদে শতকরা ৫৫টি আসন পেলে তো আমরা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে সক্ষম হবো। কিন্তু সিদ্ধান্তের ফল যে কখনো কখনো উল্টাও হয়ে যেতে পারে তা কখনো আমরা ভেবে দেখিনি।

আপনারা অনেকেই জানেন, ১৯৫৮ সনে আইয়ুব খান সামরিক আইনের সাহায্যে আমাদের সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম বানচাল করে দিয়েছিল। তারপর আর কোনোদিন ইসলামী হুকুমত হলোই না পাকিস্তানে। এই ইতিহাস থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, জামায়াতে ইসলামী মূলত ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনকারী একটি বিপ্লবী দল হিসেবেই যাত্রা শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে দলটি বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেছে ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে। কিন্তু "গণতন্ত্র উদ্ধার" কখনও এর আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল না। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য থেকে কখনো আমরা বিচ্যুত হইনি।

কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এখানে গণতন্ত্র উদ্ধার করলেই ইসলামী হুকুমত কায়েমের পথ কিছুমাত্র সুগম হবে না। কেননা যারাই এখানে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসবে, তারা গণতন্ত্রের বড় বড় প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের মিত্র নয়। তারা ইসলামী

আন্দোলনকে কখনও চলতে দেবে না।[১] এখানে ক্ষমতায় যারা আসবে তারা আমাদের পরিচিত, তারা ইসলামের সহায়ক শক্তি নয়— কাজেই এখানে গণতন্ত্র উদ্ধার বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনর্বহালের লক্ষ্যে আন্দোলন করার কোনো অর্থই নেই।[২] এখানে সোজাসুজি ইসলামী হুকুমত কায়েমেরই আন্দোলন করতে হবে। ইসলামী ঐক্য আন্দোলন সেই কাজই করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : নবী করীম (স)-এর নবুয়্যাত প্রাপ্তির সময় তৎকালীন আরবের সমগ্র জনগোষ্ঠী আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিলনা। কিন্তু বর্তমান সময় অধিকাংশ আল্লাহ ও ইসলামকে বিশ্বাস করে। তাহলে ঐ সময়ের কাজের যে ধারা ছিল এখনকার কাজের ধারা কি সেই একই রূপ হবে?

জবাব : এ ব্যাপারে একটা বড় বিভ্রান্তি বা ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে। আমরা অনেকেই মনে করছি যে, রাসূলে করীম (স) যখন মক্কায় তওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন মক্কার লোকেরা বুঝি আল্লাহকে একদম স্বীকারই করত না। এ কথা আসলে কুরআনের খেলাফ। কুরআন মজীদের এ আয়াতটি আপনারা পড়ে দেখুন ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

হে নবী, তুমি যদি মক্কার ঐ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে এই আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? ওরা নিশ্চয় বলবে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। (যুখরুফ-৪৯)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ওরা আল্লাহকে মানত, কিন্তু আল্লাহর সাথে তারা শরীকও করত; অর্থাৎ ওরা তওহীদে বিশ্বাসী ছিল না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে এক ও একক এই বিশ্বাস তাদের ছিল না। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধারণা ছিল তাদের মধ্যে। যেমন কেউ কেউ ধারণা করত যে, এ বিশাল সৃষ্টির ব্যাপারে নিশ্চয়ই বড় বড় দেব-দেবী আল্লাহর সাথে শরীক রয়েছে। আল্লাহর একার পক্ষে কি এই বিশাল আসমান-জমিন সৃষ্টি করা সম্ভব ? এই মনোভাব নিয়ে তারা

---

১. কেননা, সেক্ষেত্রে তারা জনগণের ম্যান্ডেটের দোহাই দিয়ে ধর্মহীন শাসন চালানোর চেষ্টা করবে এবং ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টাকে রুখে দাঁড়াবে।

২. মওলানা সাহেব একথাটি বলেছিলেন ১৯৮৬ সালে। এরশাদের স্বৈর-শাসনকালে। তার চার বছর পর দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে। তদবধি গণতান্ত্রিক শাসনও যথারীতি চলছে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের পথ তাতে কিছুমাত্র কুসুমাস্তীর্ন হয়নি, বরং কন্টকীর্ণ হয়েই চলেছে প্রতিনিয়ত।-সম্পাদক।

আল্লাহর সাথে অনেককে শরীক করত আর পূজা করত তাদের মূর্তি বানিয়ে। তাদের ধারণা ছিল এদের পূজা করলে আল্লাহ খুশি হবেন।

তাই কুরআন মজীদে প্রশ্ন করা হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى.

তোমরা এই মূর্তিগুলোর পূজা করছ কেন ? এরা কি তোমাদের ভালো-মন্দ কিছু করতে পারে ? ওরা বলত, না, না ওদের পূজা করলে ওরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট নিয়ে যাবে।

মোটকথা আল্লাহর কাছে পৌঁছানো তাদেরও লক্ষ্য ছিল। আমি একদিন জনৈক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ আচ্ছা তোমরা নিজেদের হাতে কাদামাটি আর খড়কুটা দিয়ে বানানো এই মূর্তিগুলোকে পূজা করো, ভোগ দেও। তোমরা কি মনে করো ঐগুলো তোমাদের ভগবান ? উত্তরে ব্রাহ্মণ বললো ঃ না না, আমরা কখনো তা মনে করি না। আমরা ওদের পূজা-উপাসনা করি আসলে ভগবানের কাছে আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে। এটাই হচ্ছে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

এদিক দিয়ে আপনারা বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখুন। আমরা মুসলমান আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানি, স্বীকার করি একথা সত্যি। কিন্তু আল্লাহর সিফাত اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ "সার্বভৌমত্বের মালিক, আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ— এটা কি আমরা মানছি ? না, আল্লাহ বিশ্বাসী মুসলমানরাই তা মানছি না। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আমরা নিজ হাতে তুলে নিচ্ছি। আমাদের রাষ্ট্রকর্তারা প্রত্যেক জুমার দিন মসজিদে গিয়ে নামায পড়েন, তারা ধর্ম পালন করেন আল্লাহকে খুশি করার জন্যে। কিন্তুরাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সার্বভৌমত্ব যেখানে ব্যবহার করা দরকার সেখানে তারা আল্লাহর ধারও ধারে না। সেখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। রাসূলের জামানায় মক্কার লোকদেরও ঠিক ঐ অবস্থা ছিল। একে তওহীদের দাওয়াত বলা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন, তিনি মানুষের পালনকর্তা ও আইনদাতা; তিনি মানুষের ইবাদত-বন্দেগী পাওয়ার সাথে সাথে সর্বক্ষেত্রে তার আনুগত্য পাওয়ারও একমাত্র অধিকারী।

যেমন আল্লাহ বলেছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ.

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের। (সূরা নিসাঃ ৫৯)

এ আয়াত মোতাবেক ইসলামের গোটা ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষত রাষ্ট্রীয় শাসন-প্রশাসনে মূল আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। একজন মুসলমান সর্বপ্রথম আল্লাহর বান্দা এরপর সে অন্য কিছু, দ্বিতীয় বুনিয়াদ হচ্ছে রাসূলের আনুগত্য। মূলত এটা কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র আনুগত্য নয়, বরং আল্লাহর আনুগত্যেরই একমাত্র বাস্তব পথ।

রাসূলে করীম (স) এই তওহীদী আকীদাটি ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়।

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

স্রষ্টার নাফরমানি করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য নষ্ট করে, তার নাফরমানি করে কোনো মানুষের কিংবা অন্য কোনো শক্তির আনুগত্য করা যাবে না।

এটা সুস্পষ্ট যে, এই তওহীদী আকীদা অনুযায়ী মুসলমানদের জীবন এখন আর পরিচালিত হচ্ছে না। মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, পারিবারিক জীবন, অর্থনীতি, সমাজনীতি এসব কিছুই এখন ইসলামের বিপরীত। মুসলমানদের দায়িত্বশীল লোকেরা মনে করেন যে, এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের কোনো দরকার নেই। মানুষের তৈরি আইনই যথেষ্ট। আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে হয়তো তারা মানেন, হয়তো নামায পড়েন, রোযাও রাখেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা তাওহীদী আকিদা অনুযায়ী আল্লাহর দাসত্ব করছে না। তাই বলতে হয়, তওহীদের দৃষ্টিতে তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থার মৌলিকভাবে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

***

MOULANA ABDUR RAHIM (R.) RESEARCH FOUNDATION
ESTD.2008

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৮৫/১-এ (৪র্থ তলা), পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।